بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ জুলাই, ২০২১ মোতাবেক ২৩ ওফা, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বর্তমানে আমরা হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করছি। তাঁর যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের কথা হচ্ছিল। আজও সে বরাতেই বর্ণনা অব্যাহত থাকবে। একটি যুদ্ধের নাম হল, **'বুয়ায়েব'** এর যুদ্ধ যা ১৩ হিজরী সনে আর কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছে, **জিসর** বা জিসরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর হযরত মুসান্না (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) দূতকে বলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের নিকট ফিরে যাও আর তাদেরকে বল, ইসলামী বাহিনী যেখানে রয়েছে সেখানেই যেন অবস্থান করে, শীঘ্রই সাহায্য পৌঁছে যাবে। জিসরের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হযরত উমর (রা.) ভীষণ কষ্ট পান। তিনি (রা.) গোটা আরবে বক্তা প্রেরণ করেন যারা তেজদীপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র আরবকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আরবের বিভিন্ন গোত্র জাতিগত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দলে দলে আসতে আরম্ভ করে। তাদের মাঝে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোত্রও ছিল। শুধু মুসলমানরাই ছিল না বরং খ্রিস্টানদের কিছু গোত্রও ছিল। হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের একটি সেনাদল ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন আর হযরত মুসান্না (রা.)ও ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে সেনা ঐক্যবদ্ধ করেন। **রুস্তম** এ সংবাদ পাওয়ার পর **মেহরানের** নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করে। কূফার তিন মাইল অদূরে হীরা নামক শহরের পাশে **বুয়ায়েব** অবস্থিত। বুয়ায়েব হল, কূফার নিকটবর্তী একটি নদী যা ফুরাতের শাখা নদী। উভয় পক্ষই এই স্থানে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এর নিকটেই পরবর্তীতে কূফা শহর গড়ে উঠেছিল। ইরানী সেনাপতি মেহরান (যুদ্ধ শুরুর পূর্বে) জানতে চায়, আমরা নদী পার হয়ে আসব নাকি তোমরা আসবে? হযরত মুসান্না (রা.) বলেন, তোমরা আস। পূর্বের যুদ্ধে মুসলমানরা নদী অতিক্রম করে গিয়েছিল কিন্তু এবার তিনি সমরকৌশলের অংশ হিসেবে তাদের বলেন যে, তোমরা আস। হযরত মুসান্না (রা.) নিজ সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান, আর এরপর এদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য পৃথক পৃথক অভিজ্ঞ নেতা নিযুক্ত করেন। এরপর সামুস নামের নিজের বিখ্যাত ঘোড়ায় আরোহণ করে ইসলামী সেনাবাহিনীর সারিগুলো ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি পতাকার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ–সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় এভাবে তাদের মনোবল দৃঢ় করেন যে, আমি বিশ্বাস করি– তোমাদের কারণে আজ আরবদের যেন দুর্নাম না হয়। খোদার কসম! আমি আজ আমার নিজের জন্য কেবল সেসব জিনিসই পছন্দ করি যা তোমাদের সাধারণ কোন মানুষের জন্য আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। অর্থাৎ আমি এবং তোমরা সবাই বরাবর বা সমান। এর ফলে ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ সেনারা তাদের প্রিয় নেতার ডাকে সর্বান্তকরণে সাড়া দেয় আর

কেনই বা দেবে না? তিনি যে তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সর্বদাই তাদের সাথে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন এবং সুখদুঃখে তাদের সাথে থাকতেন আর তাঁর কোন কথায় অঙ্গুলিনির্দেশের সাধ্য কারও ছিল না। সেনাবাহিনীকে দিকনির্দেশনা দিয়ে হযরত মুসান্না (রা.) বলেন, আমি তিনবার তকবীর দিব, এর মধ্যে তোমরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে আর চতুর্থ তকবীর শোনামাত্রই শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হযরত মুসান্না (রা.) প্রথমবার নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতেই ইরানী সেনাবাহিনী চটজলদি আক্রমণ করে বসে, এজন্য মুসলমানরাও (কিছুটা) তড়িঘড়ি করে এবং প্রথম তকবীর দেয়ার পরই বনু ইজল গোত্রের কেউ কেউ নিজেদের সারি ভেঙ্গে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। এভাবে সারিগুলোর মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন হযরত মুসান্না (রা.) এক ব্যক্তিকে তাদের নিকট এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন যে, সেনাপতি তোমাদের সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদেরকে আজ লাঞ্ছিত করো না, ফলে সেই গোত্র নিজেদের সামলে নেয়। এরপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় আর ইরানীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, এই যুদ্ধে ইরানীদের মৃতের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ইরানী সৈন্যবাহিনীর প্রধান মেহরানও এই যুদ্ধে নিহত হয়। এই যুদ্ধকে **'ইয়াওমুল আশার'**ও বলা হয়, কেননা এ যুদ্ধে একশ'জন এমন লোক ছিলেন যাদের প্রত্যেকে দশ জন করে সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। ইরানী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার উদ্দেশ্যে পুলের দিকে ছুটে পালাতে থাকে যেন তারা নদী পার হতে পারে, কিন্তু হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং পুল পার হবার পূর্বেই তাদেরকে ঘিরে ফেলেন আর নদীর ওপরের পুল ভেঙে দিয়ে অনেক ইরানী সৈন্যকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসান্না (রা.) দুঃখ করে বলতেন, আমি পরাজিত সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করে ভুল করেছি! এমনটি করা আমার উচিত হয় নি। তিনি (রা.) বলতেন, আমি অনেক বড় ভুল করেছি, কেননা যাদের লড়াই করার শক্তি নেই তাদের সাথে লড়াই করাটা আমার জন্য শোভনীয় নয়। ভবিষ্যতে আমি কখনও এমনটি করব না। অতঃপর তিনি (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নসীহত করে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কখনও এমনটি করবে না এবং এ বিষয়ে আমার অনুকরণ করবে না। পলায়নরত লোকদের পিছু ধাওয়া করার মত ভুল কাজটি আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এমনটি হওয়া উচিত হয় নি। মূলত এটিই হল, ইসলামের নৈতিক শিক্ষা। এই যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর অনেক বড় বড় কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব যেমন- খালীদ বিন হেলাল এবং মাসঊদ বিন হারেসাও শহীদ হয়েছিলেন। হযরত মুসান্না (রা.) শহীদদের জানাযা পড়ান এবং বলেন, খোদার কসম! কেবল এ বিষয়টিই আমার দুঃখকষ্ট লাঘবের কারণ হয় যে, এসব লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, পরম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং অটল ও অবিচল থাকেন আর তারা কোন প্রকার বিচলিত হয় নি এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হন নি। এছাড়া এ বিষয়টিও আমার দুঃখকে হালকা করে যে, শাহাদত পাপমোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হয়ে থাকে। এই যুদ্ধের স্মৃতিচারণে ঐতিহাসিকরা একটি ঘটনার উল্লেখ করে থাকেন যার মাধ্যমে মুসলমান নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্বের ওপর আলোকপাত হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে **কাওয়াদেস** নামক দূরবর্তী একটি স্থানে মুসলমান সেনাদলের নারী ও শিশুদের ক্যাম্প বা শিবির ছিল। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের একটি সৈন্যদল ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্যাম্পের সামনে পৌঁছলে মুসলমান নারীরা ভুলবশত মনে করে, এটি হয়তো সৈন্যবাহিনী যারা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এসেছে। তখন তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিশুদের বেষ্টনিতে নিয়ে নেন এবং পাথর ও লাঠিসোটা নিয়ে মরতে-মারতে

প্রস্তুত হয়ে যান। সেনাদলটি নিকটে পৌঁছার পর তারা বুঝতে পারেন, এরা তো মুসলিম বাহিনী। (এ অবস্থা দেখে) এই দলের নেতা আমর বিন আব্দুল মসীহ্ অবলীলায় বলে উঠেন, আল্লাহ্‌র বাহিনীর নারীদের এটিই শোভা পায়। **বুয়ায়েব** এর যুদ্ধ শেষ হয় ঠিকই কিন্তু এর রেখে যাওয়া প্রভাব ছিল সুগভীর। ইরানের ইসলামী অভিযানে এর পূর্বে কখনোই এত প্রাণহানি ঘটে নি। এ যুদ্ধের অন্য যে প্রভাব পড়ে তা হল, ইরাকের অধিকাংশ স্থানে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দজলা পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এছাড়া সামান্য যুদ্ধের পরই আশপাশের সেসব এলাকার ওপরও নতুনভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় যা (তারা) পূর্বে ছেড়ে এসেছিল। পক্ষান্তরে ইরানী সেনাবাহিনী পিছুহটে গিয়ে দজলার ওপারে চলে যাওয়াতেই মঙ্গল নিহিত বলে মনে করে। এই বিজয়ের পর মুসলমানেরা ইরাকের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর ১৪ হিজরী সনে **কাদসিয়ার** যুদ্ধ সংঘটিত হয়। **কাদসিয়া** বর্তমান ইরাকের একটি স্থান যা কূফা থেকে ৪৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ১৪ হিজরী সনে হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমান এবং ইরানীদের মাঝে **কাদসিয়া** নামক স্থানে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার ফলে ইরানী সাম্রাজ্য মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসে। পারস্যবাসী যখন মুসলমানদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয় তখন তারা তাদের দুই নেতা **রুস্তম** এবং **ফেরোজান**কে বলে, তোমরা উভয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত রয়েছ আর এভাবে তোমরা দু'জনই পারস্যবাসীকে দুর্বল করে শত্রুদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছ। এখন পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, আমরা যদি এভাবেই চলতে থাকি তাহলে ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা বাগদাদ, মিদিয়ানের নিকটবর্তী অঞ্চল সাবাত এবং বাগদাদ ও মসূল এর মধ্যবর্তী অঞ্চল তিকরিত যা বাগদাদ থেকে ৩০ ফারসাখ, অর্থাৎ ৯০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বিখ্যাত শহর। এরপর এখন কেবল মিদিয়ান শহরই বাকী রয়ে গেছে। তারা বলে, তোমরা উভয়ের ঐক্যমত না হলে প্রথমে আমরা তোমাদের দু'জনকে হত্যা করব, এরপর নিজেরা ধ্বংস হয়েই ক্ষান্ত হব, অর্থাৎ এরপর আমরা নিজেরাই যুদ্ধ করব। **রুস্তম** এবং **ফেরোজান বোরানকে** পদচ্যুত করে **ইয়াযদাজারদ**কে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। এরপর সমস্ত দুর্গ এবং সেনা ছাউনিগুলোকে মজবুত করে দেয়া হয়। হযরত মুসান্না (রা.) যখন পারস্যবাসীদের এসব কর্মকান্ড সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-কে অবহিত করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, খোদার কসম! অনারব বাদশাহ্‌দের মোকাবিলা আমি আরব নেতৃবৃন্দ ও বাদশাহ্‌দের মাধ্যমেই করাব। অতএব সকল নেতা, বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ, সম্মানিত বক্তা ও কবিকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। সেই সাথে হযরত মুসান্না (রা.)-কে এই নির্দেশ দেন যে, অনারব অঞ্চল থেকে বের হয়ে তোমরা সেসব উপকূলীয় অঞ্চলে চলে আসো যা তোমাদের এবং তাদের সীমান্তের নিকটবর্তী। **রবীয়া** এবং **মুজার** গোত্রের লোকদেরকেও (তিনি) সাথে নেয়ার আদেশ দেন। হযরত উমর (রা.) আরবের চতুর্দিকে নেতা প্রেরণ করে গোত্রপতি ও নেতৃবৃন্দকে মক্কায় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। হজ্জ নিকটবর্তী হওয়ায় হযরত উমর (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হজ্জের সময় আরব গোত্রগুলো সবদিক থেকে একত্রিত হয়। তিনি যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসেন তখন মদীনায় অনেক বড় এক সেনাদল সমবেত ছিল। হযরত উমর (রা.) নিজে সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন আর হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় নেতা নিযুক্ত করে তিনি (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেন এবং **সিরারে** গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেন। সিরারও মদীনা থেকে তিন মাইলের দূরত্বে অবস্থিত একটি ঝর্ণা। তিনি

বলেন, তখনও হযরত উমর (রা.)'র যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। সেনাদল নিয়ে যাত্রা করলেও তখনও এ সিদ্ধান্ত হয় নি যে, তিনি নিজেই যাবেন নাকি কিছুদূর গিয়ে অন্য কাউকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করবেন। যাহোক, তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে পরামর্শ করেন, সবাই তাঁকে ইরান যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তারা বলে, পুরো সেনাবাহিনীকে আপনার নেতৃত্বেই নিয়ে যান। **সিরার** পৌঁছার পূর্বে হযরত উমর (রা.) কারও সাথে পরামর্শ করেন নি। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাকে সেখানে যেতে বাধা দেয়। অন্যেরা বলে, আপনি সেনাবাহিনী নিয়ে অবশ্যই যান, কিন্ত হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, না। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, ইতোপূর্বে আমি মহানবী (সা.) ছাড়া আর কারও জন্যই আমার পিতামাতাকে উৎসর্গ করি নি এবং তাঁর পরেও (আর কারও জন্য) এমনটি করব না, কিন্তু আজ আমি বলছি, হে সেই ব্যক্তি যাঁর জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত! এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। (একথা) তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন। এরপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনি **সিরারেই** অবস্থান করুন এবং এখান থেকে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিন। পুনরায় তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, প্রথম থেকে আপনি দেখেছেন যে, আপনার সেনাবাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত কী ছিল? আপনার বাহিনী যদি পরাজিত হয় তাহলে তা আপনার পরাজয়ের সমতুল্য হবে না। কিন্তু যদি আপনি প্রথমেই শহীদ হয়ে যান বা পরাজয় বরণ করেন তাহলে আমার আশংকা হল, মুসলমানরা এরপর আর কখনোই তাকবীর দিতে পারবে না কিংবা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**'র সাক্ষ্যও দিতে পারবে না। বিশিষ্ট এবং বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরমর্শ করার পর হযরত উমর (রা.) একটি সাধারণ সভা করেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা)'র এ পরামর্শ পাওয়ার পর তিনি (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং এরপর একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন, যেখানে বক্তৃতায় হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ইসলাম ধর্মে একত্রিত করেছেন আর তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলাম ধর্মে সবাইকে ভাই-ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের পারস্পরিক অবস্থা হল, এক দেহের ন্যায়। এর এক অংশের কষ্ট হলে অন্য অংশও সেটি অনুভব না করে থাকতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল, তাদের বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, বিশেষত তাদের মধ্য থেকে জ্ঞানীদের পরামর্শ যেন গ্রহণ করা হয়। আর মানুষের জন্য আবশ্যক হল, যে বিষয়ে সবাই একমত ও সন্তুষ্ট হয় তার অনুসরণ ও আনুগত্য করা। আমীরের জন্য আবশ্যক হল, তিনি যেন মানুষের মধ্য থেকে বিজ্ঞপ্রাজ্ঞদের পরামর্শকে স্বীকৃতি দেন, অর্থাৎ জনগণ সম্পর্কে তাদের অভিমত এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনাকে (যেন স্বীকৃতি দেন)। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে লোকসকল! আমি এক সেনা হিসেবে তোমাদের সাথে যেতে চেয়েছিলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের পরামর্শদাতারা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে। তাই এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর যাব না, বরং অন্য কাউকে প্রেরণ করব। তখন হযরত উমর (রা.) কারও সন্ধানে ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে হযরত সা'দ (রা.)'র পত্র আসে। হযরত সা'দ (রা.) তখন নাজদ্-এর সদকা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য (কর্মকর্তা হিসেবে) দায়িত্ব পালন করছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকে কারও নাম বল যাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা যায়। হযরত

আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি তো আপনি পেয়েই গেছেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কে? হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, বেলাভূমির বাঘ সা'দ বিন মালেক, অর্থাৎ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)। অন্যরাও এই পরামর্শের সমর্থন করে।

তাবারীর ইতিহাসে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে নসীহত করেন, হে সা'দ! তুমি এটি ভেবো না যে, তোমাকে মহানবী (সা.)-এর মামা এবং সাহাবী বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লা মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং মন্দকে পুণ্য দ্বারা প্রতিহত করেন। আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার মাঝে আনুগত্য ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এই নসীহত করেন। যাত্রাকালে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আমার নসীহতকে স্মরণ রাখবে। তুমি এক কঠিন এবং গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, অতএব নিজ সত্তা এবং নিজ সাথীদের মাঝে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি কর এবং এর মাধ্যমে বিজয় যাচনা কর। আর স্মরণ রেখ! সকল অভ্যাস সৃষ্টির জন্যই একটি মাধ্যম থাকে। আর পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টির মাধ্যম হল, ধৈর্য। ধৈর্য ধারণ করলে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি হবে। অতএব, তোমাদের ওপর আপতিত সকল বিপদ এবং কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে। এর মাধ্যমে তোমাদের আল্লাহ্ তা'লার ভীতি অর্জিত হবে।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, নিজ সঙ্গী মুসলমানদের নিয়ে **শারাফ** থেকে ইরান অভিমুখে অগ্রসর হও। **শারাফ** হল, নাজাদে একটি ঝর্ণা। তিনি বলেন, সেখানে সেনাবাহিনী একত্রিত হয়েছে, সেখান থেকে (অগ্রযাত্রা) আরম্ভ কর। আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা কর আর নিজের সমস্ত বিষয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য চাও এবং স্মরণ রেখ, তুমি সেই জাতির মোকাবিলার জন্য যাচ্ছ যাদের সংখ্যা অনেক বেশি, সাজসরঞ্জাম অনেক বেশি, যুদ্ধশক্তি একান্ত সুদৃঢ়। আর এমন অঞ্চলের মোকাবিলার জন্য যাচ্ছ যা লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন এবং সুরক্ষিত, যদিও উর্বরতা এবং সতেজতার কারণে উত্তম এলাকা। আর লক্ষ্য রেখ! তাদের প্রতারণার শিকার হয়ো না যেন, কেননা তারা চতুর এবং প্রতারক লোক। আর তুমি যখন **কাদসিয়া** পৌঁছবে তখন তোমরা পাহাড়ী অঞ্চলের শেষপ্রান্ত এবং সমতল ভূমির প্রারম্ভিক প্রান্তে থাকবে। অতএব, তোমরা সে স্থলেই অবস্থান করবে এবং সেখান থেকে সরবে না। অর্থাৎ জায়গাও বলে দেন যে, সেখানেই থাকবে। শত্রুরা যখন তোমাদের আগমন সংবাদ পাবে তখন তারা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজেদের সকল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পূর্ণ শক্তিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি শত্রুদের সামনে পূর্ণ অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান থাক এবং শত্রুর সাথে লড়াইয়ে তোমাদের পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে আর তোমাদের সংকল্প সঠিক থাকে তাহলে আমি আশা করি, তোমরা তাদের ওপর বিজয় লাভ করবে।

আর এরপর তারা কখনও এভাবে একত্রিত হয়ে তোমাদের মোকাবিলা করতে পারবে না; আর যদি করেও তবে তাদের মন সায় দিবে না অর্থাৎ ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে তারা মোকাবিলা বা যুদ্ধ করবে। আর যদি ভিন্ন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, অর্থাৎ যদি পিছু হটার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা পরাজয়মূলক পরিস্থিতি দেখা হয়; তাহলে তোমরা ইরানী অঞ্চলের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে নিজেদের অঞ্চলের নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে আসবে। এর ফলে নিজেদের অঞ্চলে তোমরা অধিক মনোবল পাবে আর সেই অঞ্চল সম্পর্কে তোমরা বেশি অবগত থাকবে। পক্ষান্তরে ইরানীরা তোমাদের অঞ্চলে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং তারা সেই অঞ্চল সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, এমনকি খোদা তা'লা পুনরায় তোমাদেরকে তাদের

বিরুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ করে দিবেন। তিনি (রা.) নিশ্চিত ছিলেন, বিজয় তো হবেই; সাময়িকভাবে যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েও যায়, তবুও চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। মোটকথা, এই বাহিনীর প্রতিটি গতিবিধি হযরত উমর (রা.)'র মদীনা থেকে প্রেরিত বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিল। অতএব, তাবারী লিখেছেন,

শারাফ থেকে সৈন্যবাহিনীর যাত্রার তারিখও হযরত উমর (রা.) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং এই নির্দেশনাও প্রদান করেছিলেন যে, কাদসিয়া পৌঁছে সৈন্যবাহিনী যেন **উযায়বুল হাজানাত** ও **উযায়বুল কওয়াদেস** স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান নেয় এবং এই স্থানে যেন সৈন্যবাহিনীকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ছড়িয়ে দেয়া হয়। **উযায়েব** স্থানটিও **কাদসিয়া** ও **মুগীসা**'র মধ্যবর্তী একটি ঘাট, যা কাদসিয়া থেকে চার মাইল ও মুগীসা থেকে বত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র প্রতি প্রেরিত হযরত উমর (রা.)'র পত্র থেকে জানা যায় যে, সেখানে দু'টি উযায়েব ছিল; অর্থাৎ ইতিহাস থেকে এই বিষয়টিও জানা যায়। হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে চার হাজার মুজাহিদ সঙ্গে দিয়ে ইরান অভিমুখে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ইয়েমেনের দু'হাজার ও নাজাদের দু'হাজার সৈন্যও তাদের সাথে যুক্ত হয়; পথিমধ্যে বনু আসাদের তিন হাজার লোক ও আশআস বিন কায়েস কিন্দী নিজের অধীনে থাকা এক হাজার সাতশ' ইয়েমেনী সৈন্যসহ যোগ দেন। মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে, [আগে থেকে বিদ্যমান সৈন্যসহ] ত্রিশ হাজারের ওপরে গিয়ে পৌঁছে। এই বাহিনীর গুরুত্ব এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এতে ৯৯জন এমন সাহাবী ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তাবারী তাদের সংখ্যা ৭০-এর অধিক বলে বর্ণনা করেছেন; ৩১০জনের অধিক এমন (যোদ্ধা) ছিলেন যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বয়আতে রিযওয়ান পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভের সম্মান লাভ করেছিলেন; ৩০০জন এমন সাহাবী ছিলেন যারা মক্কা-বিজয়ে অংশ নিয়েছিলেন; ৭০০জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা স্বয়ং সাহাবী না হলেও সাহাবীদের সন্তান হওয়ার গৌরবের অধিকারী ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) **শারাফ** পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। মুসান্না (রা.) আট হাজার সেনা নিয়ে কূফার নিকটবর্তী একটি পানির ঘাট **যু-কা'র** নামক স্থানে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এই অপেক্ষারত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বশীর বিন খাসাসিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ মুসান্না (রা.) সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) শারাফ পৌঁছে হযরত উমর (রা.)-কে সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন এবং পত্রে লিখে দেন যে, পুরো বাহিনীকে দশজন দশজন করে মুজাহিদ-দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের জন্য একজন করে নেতা নিযুক্ত করে দাও এবং সেই দলগুলোর ওপর একজন বড় কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দিও; এরপর তাদের সংখ্যা গণনা করে তাদেরকে কাদসিয়া অভিমুখে প্রেরণ কোরো। আর মুগীরা বিন শু'বার দলটিকে তোমার নেতৃত্বে রাখবে। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, মুগীরা বিন শু'বার দলটিকে তোমার নিজের নেতৃত্বে রাখবে। এর পরবর্তী অবস্থার বিস্তারিত আমাকে লিখে পাঠাবে, আর এরপর প্রতিদিন যে অগ্রগতি হবে বা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে– তা আমাকে জানাতে থাকবে। হযরত সা'দ (রা.) এসব নির্দেশনা অনুসারে বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে বিস্তারিত অবস্থা লিখে

জানান। প্রতি দশজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী-ই ছিল। অপর এক পত্রে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে লিখেন, নিজ হৃদয়কে উপদেশ দিতে থাক এবং নিজের সৈন্যবাহিনীকেও উপদেশ দিতে থাক। ধৈর্য ধারণ কর; কেননা সংকল্প অনুযায়ী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়া যায়। যে দায়িত্বভার তোমার প্রতি অর্পিত হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তুমি পালন করতে যাচ্ছ তাতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন কর। অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন কর। খোদার কাছে নিরাপত্তা যাচনা কর এবং অধিকহারে **'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'** পাঠ কর। আমাকে লিখে পাঠাও যে, তোমার সৈন্যবাহিনী কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তোমাদের মোকাবিলায় শত্রুপক্ষের সেনাপতি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? কেননা কিছু নির্দেশনা, যা আমি লিখতে চাচ্ছিলাম, তা শুধুমাত্র এজন্য লিখতে পারি নি, কারণ তোমাদের ও তোমাদের শত্রুপক্ষের কতিপয় অবস্থা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবহিত নই। সার্বিক অবস্থা লিখে পাঠাও, এরপর আমি তোমাদেরকে আরো দিক-নির্দেশনা প্রদান করব। অতএব, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানস্থল সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত লিখে পাঠাও এবং সেই এলাকার অবস্থা, যা তোমাদের এবং ইরানীদের রাজধানী মিদিয়ানের মধ্যে অবস্থিত, এমনভাবে লিখে পাঠাও যেন তা আমার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার ন্যায় চিত্র ফুটে ওঠে। অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ণ চিত্র লিখে পাঠাও এবং তোমাদের সার্বিক অবস্থা আমাকে বিস্তারিতভাবে অবগত কর আর খোদা তা'লাকে ভয় কর এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাশা রাখ আর নিজ কাজের ক্ষেত্রে তাঁর-ই প্রতি ভরসা কর এবং এ বিষয়টিকে ভয় করতে থাক যে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জাতিকে এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ সর্বদা তোমাদের উক্ত বিষয়ের ভয় থাকা উচিত। এমন নয় যে, তোমাদের ঠিকাদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি তোমরা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও তবে খোদা তা'লা তোমাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়ে আসবেন আর এ কাজ অবশ্যই সম্পাদিত হবে। কাদসিয়া পৌঁছে হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে তাঁর সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠান। হযরত উমর (রা.) প্রত্যুত্তরে লিখেন, নিজ জায়গায় অবস্থান কর যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ আক্রমণের সূচনা করে। শত্রুপক্ষ যদি পরাজয় বরণ করে সেক্ষেত্রে মিদিয়ান পর্যন্ত অগ্রাভিযান পরিচালনা করবে।

হযরত সা'দ (রা.)'র বরাতে এ বিষয়ে (পূর্বেও) বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এখানে হযরত উমর (রা.)'র প্রেক্ষিতেও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে, হযরত সা'দ (রা.) খিলাফতের নির্দেশনানুযায়ী কাদসিয়ায় এক মাস অবস্থান করেন; তথাপি ইরানীদের মধ্য হতে কেউ তাদের মোকাবিলা করার জন্য আসে নি। এতে উক্ত এলাকার লোকেরা ইরানের বাদশাহ্ **ইয়াযদাজারদ**-এর কাছে পত্র লিখে যে, আরবরা কিছুদিন যাবৎ কাদসিয়াতে অবস্থান করছে আর আপনারা তাদের মোকাবিলার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি। তারা ফুরাত পর্যন্ত এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং গবাদি পশু ইত্যাদি লুটপাট করেছে। যদি সাহায্য না আসে তাহলে আমরা সবকিছু তাদের হাতে তুলে দিব। এই পত্র আসার পর **ইয়াযদাজারদ** রুস্তমকে ডেকে পাঠায় আর সে বিভিন্ন অজুহাতে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। আর তার স্থলে **জালিনুসকে** সেনাপতি নিযুক্ত করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বাদশাহ্‌র সামনে তার কোন অজুহাতই ধোপে টিকে নি এবং সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে তাকে যেতে হয়।

হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে লিখেন, রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে তুমি এমন লোকদের প্রেরণ কর যারা সম্মানিত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। অর্থাৎ বিনাকারণে যুদ্ধ শুরু করলেই হবে না, বরং শত্রুপক্ষকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। তিনি (রা.) বলেন, এই তবলীগকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের লাঞ্ছনা এবং আমাদের জন্য সফলতার কারণ করবেন। তুমি প্রত্যহ আমাকে পত্র লিখতে থাকবে। এরপর হযরত সা'দ (রা.) ১৪জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে ইরানের বাদশাহ্'র দরবারে প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে প্রেরণ করেন যেন তারা ইরানের বাদশাহ্ **ইয়াযদাজারদ**কে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে। মুসলমানরা অশ্বরোহী ছিল। সেই মুসলমানদের ওপর চাদর ছিল এবং তাদের হাতে ছিল চাবুক। সর্বপ্রথম হযরত নো'মান বিন মুকাররিন বাদশাহ্'র সাথে কথা বলেন, অতঃপর মুগীরা বিন যারারা কথা বলেন।

মুগীরা বাদশাহ্কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের সাথে হয় যুদ্ধ হবে নতুবা তোমাদেরকে কর প্রদান করতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতে- আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করবে, না হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অবশ্য তৃতীয় আরেকটি পথ আছে, যদি তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাও তাহলে এসব কিছু থেকে তোমরা নিজেদের নিরাপদ করবে। তখন **ইয়াযদাজারদ** বলে, যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হত তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করতাম। আমার কাছ থেকে তোমরা কিছুই পাবে না। এখান থেকে ভাগো। এরপর সে মাটির একটি ঝুড়ি আনিয়ে বলে, আমার পক্ষ থেকে এটি নিয়ে যাও আর সে আদেশ দিয়ে বলল, এই দূতদেরকে শহরের দ্বার দিয়ে বের করে দাও। আসেম বিন আমর সেই মাটি গ্রহণ করেন এবং হযরত সা'দ (রা.)-কে সেটি দিয়ে বলেন, সুখবর! আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দেশের চাবি প্রদান করেছেন। এ ঘটনার পর কয়েক মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষে নীরবতা বিরাজ করে। রুস্তম তার সেনাদল নিয়ে সাবাতে পড়ে থাকে। **ইয়াযদাজারদ** এর বারবার বলা সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে থাকে। লোকেরা **ইয়াযদাজারদ**কে বলে যে, আমাদের সুরক্ষা করুন অন্যথায় আমরা আরববাসীদের অনুসারী হয়ে যাব। তখন বাধ্য হয়ে রুস্তমকে আক্রমনের জন্য অগ্রসর হতে হয় আর ইরানী সেনাবাহিনী সাবাত থেকে বেরিয়ে কাদসিয়ার প্রান্তরে তাঁবু খাটায়। রুস্তম যখন সাবাত থেকে বের হয় তখন তার সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তার সাথে ছিল তেত্রিশটি হাতি। রুস্তম মিদিয়ান থেকে যাত্রা করে কাদসিয়া পৌঁছতে চার মাস সময় ব্যয় করে। রুস্তম কাদসিয়াতে শিবির স্থাপন করে পরবর্তী প্রভাতে মুসলিম সৈন্যসংখ্যার খবরাখবর সংগ্রহ করে আর মুসলমানদেরকে ফেরত যেতে বলে এবং সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেয়। রুস্তম মুসলমানদেরকে বলে, সন্ধি স্থাপন কর এবং ফেরত চলে যাও। এর প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা বলেন, আমরা জাগতিকতার আকাঙ্ক্ষায় এখানে আসি নি বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল, পরকাল। রুস্তম মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার দরবারে আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করার প্রস্তাব দেয়। রুস্তমের দরবারে উন্নতমানের মুল্যবান গালিচা বিছানো হয় আর পূর্ণ সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। রুস্তমের জন্য স্বর্ণের বিছানা পাতা হয় আর এর ওপর গালিচা বিছিয়ে এবং স্বর্ণের সুতা দিয়ে প্রস্তুত করা বালিশ বিছিয়ে খুব সুসজ্জিত করা হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হযরত রবী' বিন আমের গিয়ে উপস্থিত হন। রুস্তমের দিকে তাঁর অগ্রসর হওয়ার যে ভঙ্গি ছিল তা হল, নিজের বর্শার ওপর ভর দিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটছিলেন। বর্শার সূচাল অংশের আঘাতে গালিচার গদি ফেটেফেটে যাচ্ছিল আর এভাবে তিনি রুস্তমের কাছে পৌঁছেন

আর নিচে বসে নিজ বর্শা গালিচায় সোজা করে গেঁড়ে দেন। হযরত রবী' তিনটি প্রস্তাব রুস্তমের সম্মুখে উপস্থাপন করেন, প্রথমত আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন, আমরা আপনাদের পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করব আর আপনাদের দেশ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। নিজ দেশ আপনারাই শাসন করুন। (দ্বিতীয়ত) আমাদেরকে কর দিন তাহলে আমরা আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব। এ উভয় প্রস্তাবে যদি সম্মত না হন তাহলে আজ থেকে ঠিক চতুর্থ দিন গিয়ে আপনাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। এই তিন দিন আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হবে না– তবে শর্ত হল, চতুর্থ দিন যুদ্ধ হলে তো হবে কিন্তু এই তিন দিন আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হবে না তবে আপনারা যদি যুদ্ধ শুরু করে দেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হব। পরবর্তী দিন হযরত সা'দ (রা.) হযরত হুযায়ফা বিন মেহসনকে প্রেরণ করেন। তিনিও হযরত রবী'-এর ন্যায় উক্ত তিন প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দিন হযরত মুগীরা বিন শো'বা যান আর তিনিও নিজ কথোপকথনের শেষে নিজ পূর্বোক্ত দুই সাথীর ন্যায় বলেন, ইসলাম গ্রহণ অথবা কর প্রদান করুন নতুবা যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বলেন। তখন প্রত্যুত্তরে রুস্তম বলে, তোমরা অবশ্যই মরবে! তখন হযরত মুগীরা বলেন, আমাদের মাঝে যে নিহত হবে সে জান্নাতে যাবে আর তোমাদের মাঝে যে নিহত হবে সে জাহান্নামে যাবে আর আমাদের মাঝ থেকে যে জীবিত থাকবে সে তোমাদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করবে। হযরত মুগীরার কথা শুনে রুস্তম চরম ক্রোধান্বিত হয়ে কসম খেয়ে বলে সূর্যের শপথ! আগামীকাল পূর্ণ সূর্য উদীত হবার পূর্বেই আমরা তোমাদের সবাইকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করব। হযরত মুগীরার পরও কয়েকজন বিচক্ষণ মুসলমানকে হযরত সা'দ (রা.) রুস্তমের দরবারে প্রেরণ করেন যারা সন্ধ্যার সময় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদের সারিবদ্ধ থাকার আদেশ দেন এবং ইরানীদের সংবাদ প্রেরণ করেন যে, নদী পার হওয়া তোমাদের কাজ। যেহেতু সেতুর ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাই ইরানীদেরকে অন্য স্থানে আতিক নদীর ওপর সেতু বানাতে হয়। রুস্তম সেতু পার করার সময় বলে, আগামীকাল আমরা মুসলমানদেরকে পদপিষ্ট করব। এক ব্যক্তি বলল, যদি আল্লাহ্ চান তবেই। তার সঙ্গীদের মাঝে কোন একজন একথা বলে, হয়তো আল্লাহ্র প্রতি তার বিশ্বাস ছিল। এতে রুস্তম বলে, আল্লাহ্ যদি না-ও চায় তবুও আমরা তাদেরকে পিষে ফেলব, নাউযুবিল্লাহ্। মুসলমানরা ইতোঃমধ্যে তাদের সেনা বিন্যাস সম্পন্ন করেছিল। আর হযরত সা'দ (রা.)'র শরীরে ফোঁড়া বের হয় ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি শায়াটিকা রোগের কারণে তিনি বসতেও পারছিলেন না। তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। তাঁর (রা.) বুকের নিচে বালিশ রাখা থাকতো যার ওপর ভর করে তিনি গাছের ওপরে বানানো মাচা থেকে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতেন। হযরত সা'দ (রা.) খালেদ বিন আরফাতাকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিজয়ের কথা স্মরণ করান। ইরানীবাহিনী আতিক নদীর তীরে অবস্থান করছিল। আতিক নদী ফুরাত নদী হতে সৃষ্ট একটি শাখা-নদী। মুসলমান সৈন্যরা কোদায়েস প্রাচীর এবং পরিখার পাশে অবস্থান করছিল। **কোদায়েস** হচ্ছে কাদসিয়ার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান যেটি আতিক নদী থেকে প্রায় এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ইরানী সেনাদের মাঝে ৩০ হাজার সৈন্য শিকলাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তারা একে অন্যের সাথে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল যাতে কেউ পলায়ন করার সুযোগ না পায়। হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদেরকে সূরা আনফাল পড়ার আদেশ দেন আর যখন তা পাঠ

করা হচ্ছিল তখন মুসলমানরা নিজেদের মাঝে প্রশান্তি অনুভব করে। যোহর নামাযের পর মুসলমান এবং পারস্য সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। তারা মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। বনু তামীম গোত্রের সুদক্ষ তিরন্দাজদের ডেকে হযরত আসেম (রা.) বলেন যে, নিজেদের তির দিয়ে হাতীর ওপর আরোহিতদের ওপর আঘাত হানো আর তিনি বীর সৈনিকদের বলেন, হাতির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে সেগুলের হাওদার বাঁধন কেটে ফেল। অতএব, এমন কোন হাতি অবশিষ্ট ছিল না যাদের ওপর সাজসরঞ্জাম ও আরোহী অক্ষত ছিল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। প্রথমদিন বনু আসাদ গোত্রের পাঁচশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিল। সেই দিনকে **'ইয়াওমে আরমাস'** বলা হয়। পরবর্তীদিন প্রভাতে হযরত সা'দ (রা.) সমস্ত শহীদদের দাফন করেন এবং আহতদেরকে মহিলাদের হাতে তুলে দেন যাতে তারা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। তখনই মুসলমানরা সিরিয়া থেকে আগত সাহায্যকারী সেনাদল পেয়ে যায়।

হযরত হাশেম বিন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) সেই সাহায্যকারী সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন। এর অপর অংশে হযরত কাকা বিন আমর আমীর ছিলেন। হযরত কাকা অতি দ্রুত সফর শেষ করে আগওয়াসের প্রভাতে ইরাকের সৈন্যদের সাথে যোগ দেন। হযরত কাকা এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তার সম্মুখ বাহিনীকে দশ জনের দলে বিভক্ত করেন যারা পরস্পর হতে কিছুটা দূরে-দূরে টহল দিচ্ছিল আর পালাক্রমে মুসলমান সৈন্যদের সাথে দশজনের দল মিলিত হতো। প্রত্যেক দলের আগমনে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করা হত আর এমন মনে হচ্ছিল যে, মুসলমান সৈন্যদের ক্রমাগতভাবে সাহায্যকারী সৈন্যদল লাভ হচ্ছে। হযরত কাকা স্বয়ং প্রথম অংশে ছিলেন, সেখানে পৌঁছেই মুসলমানদের সালাম দেন এবং সৈন্যদলের আগমনের সুসংবাদ শোনান এবং বলেন, হে লোকেরা! আমি যা করছি তোমরাও তাই কর। একথা বলে তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিকে ডাক দেন। এটি শুনে **বাহমান জাযবিয়া** মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হয়। দু'জনের মাঝে যুদ্ধ হয় এবং হযরত কাকা তাকে হত্যা করেন। মুসলমানরা **বাহমান জাযবিয়ার** মৃত্যুতে এবং মুসলমানদের সাহায্যকারী সৈন্যদলের কারণে অনেক আনন্দিত ছিল। হযরত কাকা সম্বন্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি উক্তি হচ্ছে, সেই সেনাদল অপরাজেয় হয়ে থাকে যেখানে তার মত লোক থাকে। সেই দিন ইরানী সেনাবাহিনী নিজেদের হাতির মাধ্যমে যুদ্ধ করতে পারে নি কেননা, সেগুলোর 'হাওদা' (তথা পিঠে নির্মিত তাঁবু) পূর্বের দিন ভেঙ্গে গিয়েছিল।

তাই সকাল থেকেই তারা এটি ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। মুসলমানরা অন্য একটি কৌশলও অবলম্বন করে। তারা নিজেদের উটগুলোকে ঝুলন্ত কাপড় পরিয়ে দেয়, যার কারণে উট পর্দাবৃত হয়ে যায়। উটের ওপর কাপড় দেয়া হয় যার ফলে উটের দেহ এবং গলা সম্পূর্ণ পর্দাবৃত হয়ে যায়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এগুলো হাতি। এই উট যেদিকেই যেতো সেদিকেই ইরানীদের ঘোড়া এমন ভাবে ভয়ে পালাতে আরম্ভ করতো যেভাবে আগের দিন মুসলমানদের ঘোড়া ভয় পাচ্ছিল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দু'দলের অশ্বারোহীদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আর মধ্যাহ্নের একটু পর থেকে রীতিমত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় যা মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে। দ্বিতীয় এই দিনকে **'ইওয়ামে আগওয়াস'** বলা হয়। এই দিন মুসলমানরা যুদ্ধে সফল হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকালে উভয় সৈন্যদলই তাদের নিজেদের বুহ্যে অবস্থান করছিল। সেদিনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুসলমানদের মোট ২০০০ সৈন্য শাহাদত বরণ করে। অন্যদিকে ইরানী সেনাদলের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। মুসলমানরা

তাদের শহীদদের সাথে সাথে সমাহিত করছিল। আর আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য মহিলাদের কাছে হস্তান্তর করছিল। অন্যদিকে ইরানী নিহতদের লাশ সেভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছিল। সেই রাতে ইরানীরা তাদের হাতির 'হাওদা' ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। পদাতিক সৈন্যরা তাদের হাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাতির সাথে ছিল। তাই সেসব হাতি সেদিন ততটা ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করতে পারে নি যতটা তারা আগের দিন করেছিল।

হযরত সা'দ (রা.), হযরত কাকা এবং হযরত আসেমকে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, ইরানীদের সাদা হাতির হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। অতএব, হযরত কাকা এবং হযরত আসেম আক্রমণ করে হাতির দুটি চোখেই বর্শা ঢুকিয়ে দেন। ফলে চেতনা হারিয়ে সেই হাতি নিজের আরোহীকে নিচে ফেলে দেয়। হাতির শুঁড় কেটে দেয়া হয়। এরপর তীর দ্বারা আক্রমণের মাধ্যমে হাতিকে ভূপতিত হতে বাধ্য করা হয়। এরপর অন্য মুসলমানরা অপর একটি হাতির চোখে বর্শা ঢুকিয়ে দেয়। এতে কখনও সেটি ছুটে মুসলমান বাহিনীর দিকে আসত তখন তারা তাকে বল্লম বিদ্ধ করতো। আবার যখন ইরানী বাহিনীর মাঝে যেতো তখন তারা বর্শা বিদ্ধ করতো। অবশেষে **আজরাব** নামক সেই হাতি আতিক নদীর দিকে দৌড়াতে শুরু করে, আর এর দেখাদেখি অন্যান্য হাতিরাও সেই হাতির পিছনে পিছনে নদীতে ঝাঁপ দেয়; আর আরোহীসহ সেগুলো মারা যায়। দিনের তৃতীয় প্রহর অবধি এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই দিনকে **'ইওমে আমাস'** বলা হয়।

এশার নামাযের পর পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। বলা হয় তখন তরবারির শব্দ এমনভাবে শোনা যাচ্ছিল যেমন কামারের দোকানে লোহা কাটার শব্দ হয়। পুরো রাত হযরত সা'দ (রা.) জাগ্রত থাকেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়ারত থাকেন। আরব ও অনারবরা সেই রাতের মত ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। সকাল হওয়ার পরেও মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা অবিচল ছিল এবং তারা জয়লাভ করে। সেই রাতের পরদিন সকালে সবাই অনেক ক্লান্ত ছিল। কেননা পুরো রাত তারা জেগে কাটিয়েছিল। সেই রাতকে **'লাইলাতুল হারীর'** বলা হয়। এই নামকরণের কারণ হিসেবে লিখা হয়েছে যে, সেই রাতে মুসলমানরা নিজেদের মাঝে কথা বলে নি বরং শুধুমাত্র কানাঘুসা করেছে। **'হারীর'** শব্দের অর্থের উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখা আছে, তীর নিক্ষেপের সময় ধনুক থেকে মৃদু শব্দ বের হয় অথবা যাঁতা চালানোর সময় যে মৃদু শব্দ হয় (তা হল হারীর)। তাবারীতেও **লাইলাতুল হারীর** নামকরণের কারণ হিসেবে এটি লিখা আছে যে, মুসলমানরা সেই রাতে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। তারা উচ্চস্বরে কথা বলছিল না বরং তারা ক্ষীণস্বরে কথা বলছিল। এই কারণে সেই রাত **লাইলাতুল হারীর** নামে প্রসিদ্ধি পায়। যাহোক, চতুর্থদিন সকালে পুনরায় দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ইরানীরা ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে। এরপর রুস্তমের ওপর আক্রমণ করা হয়। সে আতীক নদীর দিকে পালিয়ে যায়। যখন সে নদীতে ঝাঁপ দেয়, হেলাল নামে একজন মুসলমান তাকে ধরে ফেলে এবং টেনে হিঁচড়ে তীরে নিয়ে এসে হত্যা করে। এরপর রুস্তমকে যে মুসলমান হত্যা করেছিল সে ঘোষণা করতে থাকে যে, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। আমার দিকে আস। মুসলমানরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং উচ্চস্বরে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করে। রুস্তমের নিহত হবার সংবাদ শুনে ইরানীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যাও করে এবং বড় সংখ্যককে কারাবন্দীও করে। এ দিনটিকে **ইয়াওমে কাদসিয়াহ্** বলা হয়। হযরত উমর (রা.) প্রতিদিন সকাল হতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে

আগত আরোহীদের কাদসিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। যুদ্ধের সুসংবাদ বাহক দূত যখন বলে, আল্লাহ তা'লা মুশরিকদের পরাজিত করেছেন তখন হযরত উমর (রা.) দৌড়াচ্ছিলেন আর তথ্য নিচ্ছিলেন আর সেই বার্তাবাহক নিজ উটনিতে আরোহিত ছিল আর সে হযরত উমর (রা.)-কে চিনতোও না। অবশেষে সেই দূত যখন মদীনায় প্রবেশ করে এবং মানুষ হযরত উমর (রা.)-কে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করছিল আর সালাম দিচ্ছিল তখন বার্তাবাহক হযরত উমর (রা.)-কে নিবেদন করেন, আপনি আমাকে বলেন নি কেন যে, আপনিই আমীরুল মু'মিনীন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আমার ভাই, কোন ব্যাপার না।

যাহোক, বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর (রা.) জনসমাবেশে বিজয়ের সংবাদ পাঠ করে শোনান অতঃপর এক প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা করেন। তিনি নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, সৈন্যবাহীনি যেন নিজ জায়গায় অবস্থান করে এবং সেনাবাহিনীকে যেন পুনঃবিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয় এছাড়া সংশোধনযোগ্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও যেন মনোযোগ দেয়া হয়। হযরত সা'দ (রা.) খলীফার নিকট হতে কিছু দিকনির্দেশনা নিয়েছিলেন। যেমন, কাদসিয়ার যুদ্ধে ইরানীদের পক্ষ থেকে এমন অনেকে ছিল যারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করেছিল। তাদের অনেকেই আবার এ দাবীও করছিল যে, ইরানী সরকার তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদেরকে নিজেদের দলে যুক্ত করে নিয়েছিল অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় আসে নি বরং বাধ্য হয়ে এসেছিল আর এক্ষেত্রে অনেকের দাবী সঠিকও ছিল। অনেক লোক আবার যুদ্ধের কারণে এলাকা ছেড়ে শত্রুপক্ষের এলাকায় চলে গিয়েছিল এবং ফিরে আসছিল। হযরত উমর (রা.) এসব বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য মদীনায় মজলিসে শূরা আয়োজন করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর তারা চুক্তি বজায় রেখে নিজ এলাকাতেই অবস্থান করেছে, শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেয় নি– তাদের সাথে কৃত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল না কিন্তু নিজ এলাকায় অবস্থান করেছে, শত্রুপক্ষে গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে সারিতে যোগ দেয় নি তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ব্যবহারই করা হবে যে ব্যবহার চুক্তিবদ্ধদের সাথে করা হচ্ছে। যারা দাবী করে যে, ইরানী সরকার তাদেরকে জোরপূর্বক নিজ সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে আর তাদের দাবী যদি সত্য প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে তাদের সাথেও মুসলমানদের সদাচরণে কোন কার্পণ্য করা হবে না। তাদেরকেও যেন কিছু বলা না হয়। তবে যারা এই দাবীতে মিথ্যাবাদী যে, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে বরং যদি স্বেচ্ছায় শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের পূর্বের চুক্তি রহিত হয়ে গেছে কেননা, তারা শত্রু পক্ষের সঙ্গ দিয়েছে। তাদের বিষয়ে নির্দেশনা হল, হয় তাদের সাথে পুনরায় সন্ধিচুক্তি হবে নতুবা তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের সাথে পুনরায় চুক্তি করে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে, বসবাসের জন্য তারা যেখানে যেতে চায় চলে যাবে। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই আর তারা এই এলাকা ছেড়ে শত্রুর এলাকায় চলে গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সমীচীন মনে কর তাহলে তাদেরকেও ডেকে নাও, তারা যেন কর প্রদান করে। যতদূর সম্ভব নম্র আচরণ করতে হবে এবং তারা তোমাদের এলাকায় থাকবে। আর যদি তোমরা সমীচীন মনে কর যে, তোমরা তাদের ডাকবে না আর তারা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখ। অর্থাৎ এরপরও যদি তারা সেখানে থাকে এবং যুদ্ধ

করতে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে তোমাদেরও যুদ্ধ করার অধিকার আছে কিন্তু শত্রুর সাথে হাত মিলানো সত্ত্বেও তারা যদি বিরত হয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দিবে। এসব নির্দেশনা অনেক কার্যকরী প্রমাণিত হয় এবং আশপাশের লোকেরা ফিরে এসে নিজ নিজ জমিতে বসতি ও চাষাবাদ শুরু করে।

আর (এটি) মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কত বড় মহানুভবতা ছিল যে, মুসলমানরা তাদেরকেও নিজেদের জমি চাষাবাদের জন্য ফিরিয়ে আনে যারা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়ে নিজেদের সকল চুক্তি লঙ্ঘন করে শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছিল। যদিও মদীনার পরামর্শ সভা তাদেরকে এই বিষয়ের অনুমতি দিয়ে রেখেছিল যে, তোমরা চাইলে এমন ইরানীদের ফিরিয়ে আনতে পার অথবা নাও আনতে পার– সেক্ষেত্রে তাদের জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে সেসব জমি বণ্টন করে দিবে। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, এমন সংকটকালে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের ফিরিয়ে আনা হয় আর তাদের আবাদি জমির ওপর সাধারণ আবাদি জমির চেয়ে বেশি কর বা খাজনা ধার্য্য করা হয়েছিল। কেবলমাত্র এই একটি শর্তই আরোপ করা হয়েছিল যে, তোমরা চুক্তিভঙ্গ করেছ, (এখন) ফিরে আসো (এবং) নিজেদের ভূমি আবাদ কর, কিন্তু এই জমির কর বা খাজনা তোমাদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি দিতে হবে, কিন্তু তারপরও জমির মালিক তোমরাই থাকবে। ইরাকের বিভিন্ন বিজয়ের ক্ষেত্রে এ যুদ্ধটির আঘাত ছিল মোক্ষম। মুসলমান মুজাহিদরা অত্যন্ত অবিচলতা ও বীরত্বের সাথে চরম বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, খিলাফতের দরবার হতে যখন মানুষের জন্য ভাতা নির্ধারিত হয় তখন এক্ষেত্রে কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকেও একটি বিশেষ মর্যাদার কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিক ভাতা নির্ধারণ করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদসিয়ার যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে যা বলেছেন তার মধ্য থেকে কিয়দাংশ বর্ণনা করছি।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন খসরু পারভেজ এর পৌত্র ইয়াযদাজারদ সিংহাসনে সমাসীন হয় আর ইরাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় তখন হযরত উমর (রা.) তাদের মোকাবিলা করার জন্য হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) যুদ্ধের জন্য কাদসিয়ার প্রান্তরকে নির্বাচন করেন আর হযরত উমর (রা.)-কে উক্ত জায়গার মানচিত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) এই স্থানটি খুবই পছন্দ করেন কিন্তু এর পাশাপাশি লিখেন, ইরানের সম্রাটের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে তোমার জন্য আবশ্যক হল, একটি প্রতিনিধি দল ইরানের সম্রাটের কাছে প্রেরণ করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাও। অতএব, এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি ইয়াযদাজারদের সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল যখন পারস্য-সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয় তখন সম্রাট তার দোভাষীকে বলেন, এদেরকে জিজ্ঞেস কর, এরা কেন এসেছে? তারা আমাদের দেশে কেন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। সে এই প্রশ্ন করলে প্রতিনিধি দলের নেতা হযরত নু'মান বিন মোকাররিন (রা.) দাঁড়ান এবং তিনি মহানবী (সা.) আবির্ভাবের উল্লেখ পূর্বক বলেন, তিনি (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ইসলামের প্রচার-প্রসার করি আর বিশ্বের সকল মানুষকে সত্য ধর্মে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। এই নির্দেশ পালনার্থে আমরা আপনার

সমীপেও উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এই উত্তর শুনে ইয়াযদাজারদ চরম অসন্তুষ্ট হয় (আর) বলতে আরম্ভ করে, তোমরা এক বন্য ও মৃতখেকো জাতি। ক্ষুধা ও দারিদ্র তোমাদেরকে এই যুদ্ধে আসতে বাধ্য করে থাকলে আমি তোমাদেরকে এত পরিমাণ পানাহার সামগ্রী প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে নিজেদের জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে, এছাড়া তোমাদের পরিধানের জন্য পোশাকও প্রদান করবো। তোমরা এসব সামগ্রী নাও আর নিজেদের দেশে ফিরে যাও। আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা কেন নিজেদের প্রাণ বিনষ্ট করতে চাচ্ছ? সে কথা শেষ করার পর ইসলামী প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে হযরত মুগীরাহ্ বিন যারারাহ্ (রা.) দাঁড়ান এবং তিনি বলেন, আপনি আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা একেবারেই যথার্থ। আসলেই আমরা বন্য এবং মৃতখেকো জাতি ছিলাম। আমরা সাপ, বিচ্ছু, ফড়িং এবং টিকিটিকি পর্যন্ত খেয়ে ফেলতাম কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন আর তিনি আমাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর কথার ওপর আমল করেছি যার ফলে এখন আমাদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে।

এখন আমাদের মাঝে সেসব বদভ্যাস নেই যেগুলোর কথা উল্লেখ আপনি করেছেন। এখন আমরা কোন প্রলোভনেই প্রলুব্ধ হব না। আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। অর্থাৎ আপনি যদি এটিই চান, আমাদের প্রস্তাবে যদি আপনি সম্মত না হন এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান, তবে তা-ই সই; আমরাও যুদ্ধ করব। জাগতিক ধনসম্পদের প্রলোভন আমাদেরকে আমাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। **ইয়াযদাজারদ** একথা শুনে চরম ক্রোধান্বিত হয়ে তার এক ভৃত্যকে সামনে ডেকে আদেশ দেয়, যাও এক বস্তা মাটি নিয়ে আস। মাটির বস্তা এসে উপস্থিত হলে সে ইসলামী প্রতিনিধি দলের প্রধানকে সামনে আসতে বলে এবং বলে, তুমি যেহেতু আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ তাই এখন এই মাটির বস্তা ছাড়া তোমরা আর কিছুই পাবে না। (এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এখানে কিছুটা বিস্তারিত রয়েছে) সেই সাহাবী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এগিয়ে গিয়ে নিজের মাথা নিচুঁ করে মাটির বস্তা পিঠে তুলে নেন। এরপর তিনি লাফ দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দরবারের বাইরে চলে আসেন এবং নিজের সঙ্গীদের উচ্চস্বরে বলেন, আজ পারস্য-সম্রাট নিজ হাতে আমাদেরকে তার দেশের মাটি তুলে দিয়েছেন। এই বলে তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়েন। বাদশাহ্ যখন তার এই কথা শোনে, সে কেঁপে ওঠে এবং নিজ দরবারের লোকদেরকে বলে, দৌড়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে মাটির বস্তা ফেরত নিয়ে আস। বাদশাহ্ বললো, এতো বড় অলক্ষুণে কাজ হয়েছে! আমি নিজ হাতে এদেশের মাটি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি! তবে ততক্ষণে ইসলামী প্রতিনিধি দল ঘোড়ায় চেপে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাই হয়েছে যা তারা বলেছিল আর কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এই মহান পরিবর্তন মুসলমানদের মাঝে সাধিত হওয়ার কারণ কী ছিল? এর কারণ হল, কুরআনের শিক্ষা তাদের স্বভাব-চরিত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছিল। তাদের তুচ্ছ জীবনে তা এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে এক উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উচ্চ মার্গে উপনীত করেছিল; এ কারণেই এ বিপ্লব সাধন

হয়েছিল। অতএব, কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার মাধ্যমেই প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহা তা'লা আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)